بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ১৩ তাবূক, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আহযাবের যুদ্ধের বরাতে গত খুতবায় আলোচনা হচ্ছিল যে, কীভাবে খায়বারের ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্বেষের ফলশ্রুতিতে কাফিরদের একটি সেনাদল গঠিত হয়, যাতে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংস করা যায়। এর আরও বিশদ বিবরণ ইতিহাসে এভাবে পাওয়া যায় যে,

মহানবী (সা.) সুলাইত ও সুফিয়ান বিন অওফ আসলামী (রা.)-কে সেনাদলের সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলে তার উভয়ে যান। তারা যখন **'বায়যা'** নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তাদের দুজনের প্রতি আবু সুফিয়ানের অশ্বারোহীদের দৃষ্টি পড়ে, শত্রুরা তাদেরকে দেখতে পায়। এরপর তারা উভয়ে লড়াই করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। **'বায়যা'** মক্কা এবং মদীনার মাঝখানে **'যুল হুলায়ফা'** থেকে (কিছুটা) এগোলে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর, আর **'যুল হুলায়ফা'** মদীনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরত্বে অবস্থিত। তাদের উভয়কে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসা হয় এবং একই কবরে (তাদেরকে) সমাহিত করা হয়।

লেখা আছে যে, যখন পরিখা খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তখন মহানবী (সা.) নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং তাঁর (সা.) সাথে কয়েকজন মুহাজির এবং আনসারও ছিলেন। তিনি (সা.) সেনাবাহিনীর শিবির স্থাপনের জন্য একটি জায়গার সন্ধান করেন; তখন তাঁর দৃষ্টিতে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান মনে হয়, সালাহ্ পর্বতকে নিজের পেছনের দিকে রেখে **মাযায** থেকে **যুবাব** এবং **রাতেজ** পর্যন্ত পরিখা খনন করা। মাযায ছিল মদীনায় সালাহ্ পর্বতের নিকটবর্তী একটি স্থান এবং যুবাব ছিল মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম। রাতেজ মদীনার দুর্গগুলোর মধ্য হতে একটি দুর্গ, (আর) এটি ইহুদীদের দুর্গ ছিল। এটিও কথিত আছে যে, যুবাবের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ছোট্ট পাহাড় ছিল (রাতেজ)। কাজেই, সেদিন পরিখা খননের কাজ আরম্ভ হয় এবং মুসলমানরা বনু কুরায়যার কাছ থেকে খননের জন্য অনেক সরঞ্জাম যেমন কোদাল, বড়ো কুঠার, বেলচা প্রভৃতি ধার নেয় এবং মহানবী (সা.) পরিখার প্রত্যেক দিকের খননের কাজ একেকটি গোত্রের প্রতি অর্পণ করেন। তিনি (সা.) সাহাবীদের দশজন করে একেকটি দলে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক দশজনের জন্য প্রায় চল্লিশ গজ অংশ নির্ধারণ করেন। মহানবী (সা.) নিজেও খননকাজে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের পিঠে করে মাটি বহন করেন, এমনকি তাঁর পিঠ ও পেট ধূলোমলিন হয়ে যেত। যেসব মুসলমান নিজেদের কাজ (আগেভাগে) শেষ করে ফেলতেন তারা অন্যদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে যেতেন, এভাবে পরিখা খনন সম্পন্ন হয়। [এমন নয় যে, কারো কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা বসে পড়তেন, বরং নিজেদের সাথিদের সাহায্যের জন্য পৌঁছে যেতেন।]

পরিখা খননের কাজে কোনো মুসলমান পিছিয়ে ছিলেন না, আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) যখন কোনো ঝুড়ি না পেতেন তখন দ্রুত নিজেদের কাপড়ে করে মাটি বহন করতেন। যে চাদর সামনে পেতেন তাতেই মাটি তুলে নিয়ে যেতেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন। তিনি (রা.) বলেন, এত বিশাল সৈন্যদলের গতিবিধি গোপন রাখা কাফিরদের জন্য কঠিন ছিল। অধিকন্তু মহানবী (সা.)-এর গোয়েন্দা ব্যবস্থাও অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। তাই কুরাইশ সেনাবাহিনী মক্কা থেকে যাত্রা করার সাথে সাথেই মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে অবগত হন। তখন তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে জড়ো করে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেন। এ পরামর্শে ইরানের এক নিষ্ঠাবান সাহাবী সালমান ফার্সীও অংশ নিয়েছিলেন। যেহেতু সালমান ফার্সী অনারব যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন, অর্থাৎ অনারবদের রণকৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, তিনি (রা.) এই পরামর্শ প্রদান করেন যে, মদীনার অরক্ষিত অংশের সম্মুখে একটি দীর্ঘ ও গভীর পরিখা খনন করে নিজেদের সুরক্ষিত করা হোক। পরিখার ধারণা আরবদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে অবগত হয়ে যে, এই রণকৌশল অনারবদের মাঝে সাধারণ্যে সফলতার সাথে প্রচলিত আছে, মহানবী (সা.) এই পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করেন। গত খুতবায়ও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তাঁকে (সা.) আল্লাহ্ তা'লাও জানিয়েছিলেন যে, এটি সঠিক পদ্ধতি।

যাহোক, লেখা আছে, যেহেতু মদীনা শহরের তিন দিক যথেষ্ট নিরাপদ ছিল, অর্থাৎ বাড়িঘরের অবিচ্ছিন্ন প্রাচীর এবং ঘন গাছপালা ও পাথরের সারি থাকার কারণে এই অংশগুলো কাফির সেনাদের আকস্মিক আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল। কেবলমাত্র সিরিয়া (অভিমুখী) দিকটি-ই এমন ছিল, যেদিক দিয়ে শত্রুরা দলবদ্ধ হয়ে মদীনায় আক্রমণ করতে পারতো। তাই মহানবী (সা.) এই অরক্ষিত অংশে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন এবং মহানবী (সা.) তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট স্থান চিহ্নিত করে বণ্টনরীতি অনুযায়ী পরিখাকে দশ হাত করে, অর্থাৎ ১৫ ফুট করে এক একটি অংশে বিভক্ত করে, একেকটি অংশ দশজন সাহাবীর ওপর ন্যস্ত করেন। এই দলগুলো বিভাজনের ক্ষেত্রে এক মধুর বিড়ম্বনা দেখা দেয় যে, সালমান ফার্সী কোন দলে গণ্য হবেন। প্রত্যেক দলই সালমান ফার্সীকে তাদের দলে নিতে চাইত। অর্থাৎ, তাকে কি মুহাজির গণ্য করা হবে, নাকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই তিনি মদীনায় চলে এসেছিলেন বিধায় তিনি আনসার বলে গণ্য হবেন? যেহেতু সালমান ফার্সী (রা.) এই রণকৌশলের প্রবর্তক ছিলেন আর তিনি বার্ধক্য সত্ত্বেও একজন সক্রিয় ও শক্তিশালী মানুষ ছিলেন, তাই প্রত্যেক পক্ষই তাকে নিজেদের দলে নিতে চাচ্ছিল। অবশেষে এই মতানৈক্যের কথা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হলে তিনি (সা.) উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনেন। অর্থাৎ উভয়পক্ষ যে দাবি করেছিল তা তিনি (সা.) শোনেন, এরপর মুচকি হেসে বলেন, সালমান তোমাদের কারো মধ্য হতেই নয়। সে মুহাজিরদের মধ্য হতেও নয় কিংবা আনসারের মধ্য হতেও নয়, বরং **'সালমানু মিন্না আহলাল বায়ত'**- অর্থাৎ সালমান আমার আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। সে সময় থেকে হযরত সালমান ফার্সী (রা.)-র এই সৌভাগ্য অর্জিত হয় যে, তাঁকে যেন মহানবী (সা.)-এর পরিবারের সদস্য জ্ঞান করা আরম্ভ হয়।

যাহোক, পরিখা খননের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবার পর সাহাবীদের দল শ্রমিকদের পোশাক পরিধান করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। খননের কাজ এতটা সহজ কাজ ছিল না, অনেক কষ্টসাধ্য কাজ ছিল। উপরন্তু শীতের মৌসুম ছিল। যে কারণে সেই দিনগুলোতে সাহাবীদেরকে চরম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। আর যেহেতু অন্যান্য কাজকর্মও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল, তাই যারা দিনমজুর ছিলেন; [সাহাবীদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। অর্থাৎ যারা দিনমজুর ছিলেন এবং এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়েই তাদের প্রাত্যহিক খাবার জুটতো;] তাই যারা দিনমজুর ছিলেন তাদেরকে সেই দিনগুলোতে ক্ষুধা

এবং অনাহারের কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। আর যেহেতু সাহাবীদের নিকট চাকর বা ক্রীতদাসও ছিল না, এজন্য প্রত্যেক সাহাবীকে স্বহস্তেই নিজের কাজ করতে হতো। দশজন করে যে–সব দল গঠন করা হয়েছিল তারা তাদের কাজকে নিজেদের মাঝে এভাবে বণ্টন করেছিলেন যে, কিছু লোক খনন করতো আর কিছু লোক খননকৃত মাটি ও পাথর ঝুড়িতে বোঝাই করে নিজ কাঁধে বহন করে বাইরে ফেলে আসতেন। মহানবী (সা.)ও তাঁর অধিকাংশ সময় পরিখার পাশেই অতিবাহিত করতেন এবং কখনো কখনো স্বয়ং সাহাবীদের সাথে মিলে খনন ও মাটি বহনের কাজ করতেন।

পরিখা খননের সময় মানুষকে উজ্জীবিত রাখার জন্য পঙ্‌ক্তিও পাঠ করা হতো। এর বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে, হযরত সাহ্‌ল বিন সা'দ (রা.) ও হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন আমাদের নিকট আগমন করেন তখন আমরা পরিখা খনন করছিলাম এবং নিজেদের কাঁধে করে মাটি স্থানান্তর করছিলাম। যখন তিনি (সা.) আমাদের এই কঠোর পরিশ্রম ও ক্ষুধার তাড়না দেখেন তখন বলেন,

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ ... فَاغْفِرِ الْأَنْصَارَ والْمُهَاجِرَ

(উচ্চারণ: **"আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশাল্ আখিরা ... ফাগফিরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরা"**)

অর্থাৎ, **হে আল্লাহ! পারলৌকিক স্বাচ্ছন্দ্যই প্রকৃত স্বাচ্ছন্দ্য। অতএব, তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও।**

তখন সাহাবীরা মহানবী (সা.)-কে প্রত্যুত্তরে বলেন,

نَحْنُ الَّذِيْ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا

(উচ্চারণ: **"নাহনুল্লাযী বাইয়ায়ূ মুহাম্মাদা...আলাল্ জিহাদে মা বাকীনা আবাদা"**) অর্থাৎ, **আমরা সেই দল যারা মুহাম্মদ (সা.)-এর হাতে আমৃত্যু জিহাদের শর্তে বয়আত করেছি।** হযরত বারা বিন আযেব থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, খন্দকের দিন আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে মাটি বহন করতে দেখেছি। এমনকি তাঁর (সা.) পবিত্র উদরের শুভ্রতা মাটিতে ঢাকা পড়ে যায়। আমি তাঁকে (সা.) ইবনে রওয়াহা-র এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করতে শুনেছি যে,

واللهِ لَوْلَا مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا،

فَأَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقِيْنَا،

والمشركون قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا... اذا أَرَادُوْا فِتْنَةً أَبَيْنَا

(উচ্চারণ: **"ওয়াল্লাহে লাও লা মাহ্‌তাদাইনা, ওয়া লা তাসাদ্দাকনা, ওয়া লা সাল্লাইনা। ফাআনযিলান সাকিনাতান আলাইনা, ওয়া সাব্বিতিল আকদামা ইন লাকীনা। ওয়াল মুশরিকূনা ক্বাদ বাগাউ আলাইনা, ইযা আরাদূ ফিতনাতান আবাইনা।**")

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যদি তোমার অনুগ্রহ না হতো তাহলে আমরা হিদায়াত পেতাম না। আর আমরা দান-সদকা করার আর তোমার ইবাদত করার যোগ্য হতে পারতাম না। অতএব হে খোদা! তুমি যেহেতু আমাদের এই পর্যায়ে উপনীত করেছো অতএব এখন এই বিপদের সময় আমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করো। আর যদি শত্রুর সাথে মোকাবিলা হয় তাহলে আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ় রাখো। তুমি জানো যে, এরা আমাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে আক্রমণ করছে আর তাদের উদ্দেশ্য হলো

আমাদেরকে নিজেদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। কিন্তু হে আমাদের খোদা! তোমার কৃপায় আমদের অবস্থা হলো এই যে, যখন তারা আমাদেরকে ধর্মবিচ্যুত করার জন্য কোনো অপচেষ্টা করে তখন আমরা তাদের অপচেষ্টাকে দূর হতেই প্রত্যাখ্যান করি। আর তাদের নৈরাজ্যের শিকার হতে অস্বীকার করি। আর তিনি (সা.) **আবাইনা, আবাইনা** শব্দ উচ্চৈঃস্বরে বলতেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, পঙ্‌ক্তির শেষে শব্দকে দীর্ঘায়িত করতেন।

যাহোক, পরিখার খননকাজ একটি পরিশ্রমসাধ্য কাজ ছিল। আর অন্য সাহাবীদের সাথে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-ও পরিখা খননে অংশ নিয়েছেন। কখনো তিনি কোদাল চালাতেন আর কখনো বেলচা দিয়ে মাটি জড়ো করতেন। আবার কখনো ঝুড়িতে করে মাটি ওঠাতেন। একদিন তিনি (সা.) অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি বসে পড়েন। এরপর তিনি তাঁর বামপাশে পাথরে হেলান দেন এবং তাঁর ঘুম চলে আসে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) তাঁর (সা.) শিয়রে দাঁড়িয়ে মানুষকে তাঁর পাশ দিয়ে যেতে বারণ করতে থাকেন যেন তারা মহানবী (সা.)-কে আবার জাগিয়ে না দেয়। কিছুক্ষণ পর তিনি (সা.) যখন জাগ্রত হন তখন দ্রুত উঠে বসেন এবং বলেন, তোমরা আমাকে জাগাও নি কেন? আমি ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, আমাকে জাগাও নি কেন? এরপর তিনি (সা.) বড়ো কোদাল নিয়ে মাটিতে আঘাত করা আরম্ভ করেন, অর্থাৎ কাজ আরম্ভ করে দেন।

মহানবী (সা.)-এর অংশগ্রহণ ও তাঁর দোয়ার কল্যাণে সাহাবীরা তো যেন নিজেদের দুঃখ-বেদনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের কষ্ট ভুলেই যেতেন। আর যেখানে একদিকে পবিত্র কবিতা আবৃত্তি হতো সেখানে অপরদিকে অল্পসল্প রসিকতাও চলত। যেমন, একবার হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), যিনি কম বয়সী যুবক ছিলেন, পরিখা খনন করতে করতে পরিখার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লে তার এক বন্ধু ঠাট্টাচ্ছলে তার খননযন্ত্র উঠিয়ে নেয়। তিনি জাগ্রত হয়ে নিজের কাজের জিনিস না পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। তার এই অস্থিরতা দেখে অন্য বন্ধুরা আনন্দ উপভোগ করতে থাকে। মহানবী (সা.) যখন জানতে পারেন তখন তিনি হযরত যায়েদ (রা.)-কে বলেন, হে বালক! তুমি এমনভাবে ঘুমিয়েছো যে, নিজের জিনিসেরও কোনো খবর রাখো নি! এক বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত যায়েদের কাছে এসে মুচকি হেসে বলেন, **'ইয়া আবা রুকাদ'** অর্থাৎ, হে নিদ্রার পিতা! যদিও একইসাথে তিনি (সা.) প্রজ্ঞার মাধ্যমে এরূপ হাসি-তামাশার সংশোধনও করেন এবং বলেন, যায়েদের কাজের জিনিসটির খবর কি কেউ জানে? তখন এক ব্যক্তি নিবেদন করে, হুযূর! তার জিনিসটি আমার কাছে আছে আর আমিই নিয়েছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, কোনো মুসলমানকে এভাবে বিরক্ত করা উচিত নয় যে, তার অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি (অগোচরে) উঠিয়ে নেওয়া হবে।

সাহাবীদের অবিশ্রান্ত দিবা-রাত্রির পরিশ্রম এবং মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে এই পরিখা খনন সম্পূর্ণ হয়। মুসলমানরা পরিখা খনন করে তা মজবুত করে দেয়। পরিখা খনন কতদিনে সমাপ্ত হয়েছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে যে, ছয় দিন, দশ দিন, পনেরো দিন, বিশ দিন এবং এক মাস। উক্ত সময়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। পনেরো দিন এবং এক মাস সম্পর্কে অধিক ঐকমত্য পোষণ করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য আনুমানিক ছয় হাজার গজ অথবা প্রায় সাড়ে তিন মাইল ছিল, প্রশস্ততা নয় হাত এবং গভীরতা সাত হাত ছিল। এক হাত সমান দেড় ফুট বলা হয়ে থাকে। সেই হিসেবে প্রশস্ততা তেরো-চৌদ্দো ফুট এবং গভীরতা দশ-এগারো ফুট হয়। এই দীর্ঘ ও প্রশস্ত পরিখা শতাব্দী কালব্যাপী দৃশ্যমান ছিল। অবশেষে বাতহান উপত্যকার পানির অবিরাম প্রবাহ এবং ক্ষয়ের কারণে সেটি ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। বাতহান হলো মদীনার তিনটি বিখ্যাত উপত্যকার মাঝে একটি

উপত্যকা। অপর দুটি উপত্যকা হলো আকীক ও কিনাহ্ উপত্যকা। এই পরিখার কিছু অংশ মানুষ ভরাট করেছিল যেন এপার-ওপার যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়। আর অবশিষ্টাংশ বাতহান উপত্যকার নালার পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। পলি বলা হয় নদীর স্রোত বা বৃষ্টির পানির সাথে আনীত নরম মাটি যা স্তরীভূত হয়। এই (পলিমাটি) দ্বারা ভরাট হয়ে যায়। ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর মদীনার প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ হাফেয ইবনে নাজ্জার লিখেন, পরিখার বিষয়টি হলো, আজও আমাদের যুগে সেটি দৃশ্যমান আছে, যদিও তা একটি নালার আকৃতি ধারণ করেছে। এর দেয়াল অধিকাংশ স্থানে বিলীন হয়ে গেছে এবং বহু সংখ্যক খেজুরের গাছ এর ভেতর গজিয়েছে। নবম হিজরী শতাব্দীর একজন লেখক লেখেন, বর্তমানে এই পরিখার কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ ছয়শ বছর পর্যন্ত এটি দৃশ্যমান ছিল। নবম শতাব্দীতে তিনি বলেন, কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট নেই, কেবল এতটুকু ব্যতিরেকে যে, এর অবস্থানস্থল সেই নদীর মাধ্যমে জানা যায় যা বাতহান উপত্যকার অংশ এবং এর স্থানে প্রবাহিত হচ্ছে।

লিখিত আছে যে, মদীনায় এই দিনগুলো ভয়ভীতি ও উদ্‌বেগে ভরা থাকলেও মুনাফিকরা নানান অজুহাতে নিজেদের বাড়িঘর ও শিবিরে ফিরে যেতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সাহাবীদের সামগ্রিক উত্তেজনা ও উদ্দীপনা ছিল দেখার মতো। শিশু এবং নারীরাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের সাহস যোগানো এবং তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিল। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদেরও এই বিপদের মুহূর্তে দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে মহানবী (সা.)-এর পাশে দণ্ডায়মান দেখা যায়। পরিখা যেহেতু মদীনার বাইরে খনন করা হচ্ছিল আর মহানবী (সা.) বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকতেন এবং মদীনার নারী ও শিশুদের মদীনার কয়েকটি শক্তিশালী দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তাই মাঝে মাঝে হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে যেতেন ও কয়েকদিন থাকতেন। তারপর হযরত উম্মে সালামা কয়েকদিন থাকতেন। এরপর হযরত যয়নব কয়েকদিন থাকতেন। আর অন্য সব পবিত্র স্ত্রীরা বনু হারেসার মজবুত দুর্গে ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, পবিত্র স্ত্রীরা বনু যুরায়েক-এর নাসর দুর্গে ছিলেন। আরও বলা হয়েছে যে, কয়েকজন স্ত্রী ফারে-তে ছিলেন। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা। ফারে হলো মদীনায় হযরত হাসসান বিন সাবেত-এর দুর্গ।

পরিখা খননের সময় কিছু অলৌকিক ঘটনাও ঘটেছে, তার মধ্যে খননকালে পাথর না ভাঙার ঘটনাও বর্ণনা করা হয়। রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, পরিখা খননের সময় একটি শক্ত এবং পাথুরে স্থান আসে আর সাহাবীদের কঠোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সে স্থান খননে তারা অপারগ হয়ে পড়েন। অবশেষে তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন জানান। তিনি (সা.) একটি কোদাল নিয়ে সেই জায়গায় আঘাত করেন এবং সেই পাথুরে মাটি বালির মতো ঝুরঝুরে হয়ে যায়। একটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) সামান্য পানি আনান এবং তাতে নিজ মুখের লালা মিশিয়ে দেন। তারপর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করেন। আর এরপর তিনি সেই পাথুরে মাটিতে এই পানি ছিটিয়ে দেন। তখন সেখানে উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কতক সাহাবী বলেন, সেই সত্তার কসম যিনি মহানবী (সা.)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এই পানি পড়তেই সেই জমি নরম হয়ে বালির ন্যায় হয়ে যায়।

যেখানে রাজত্বের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল সেটি দ্বিতীয় ঘটনা আর দ্বিতীয় ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, (প্রথম ঘটনাটি ছিল পানি ছিটানোর ঘটনা।) আর যেটিতে তাঁকে (সা.) ভবিষ্যৎ রাজত্বের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে অন্য একটি স্থানে

উল্লেখ আছে যে, হযরত সালমান ফার্সী একটি পাথর ভাঙতে পারছিলেন না। তখন মহানবী (সা.) হযরত সালমানের কাছ থেকে কোদাল নিয়ে নেন। অর্থাৎ হযরত সালমান ফার্সীর দ্বারা একটি পাথর ভাঙছে না দেখে মহানবী (সা.) তার হাত থেকে কোদাল নিয়ে সেটির ওপর একটি আঘাত করেন, ফলে বিদ্যুৎচমকের মতো একটি ঝলকানি দেখা যায়। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহু আকবার। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সাহাবীরাও **আল্লাহু আকবার** বলেন এবং এর একটি অংশ ভেঙে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) দ্বিতীয়বার আঘাত করেন এবং তা থেকে একটি ঝলকানি বের হয়। মহানবী (সা.) বলেন, **আল্লাহু আকবার**। এরপর পাথরের আরও কিছু অংশ ভেঙে যায়। অতঃপর মহানবী (সা.) তৃতীয়বার আঘাত করেন এবং অবশিষ্ট পাথরটিও ভেঙে যায় আর সেখান থেকে আবারও আলোর ঝলকানি বের হয়। তখনও মহানবী (সা.) **আল্লাহু আকবার** বলেন। সাহাবীরাও প্রতিবার **আল্লাহু আকবার** বলেন। হযরত সালমান ফার্সী, যিনি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যখন কোদাল দিয়ে আঘাত করতেন তখন পাথর থেকে একটি আলো দেখা দিত এবং আপনি **আল্লাহু আকবার** বলতেন। এটি শুনে তিনি (সা.) বলেন, হে সালমান! তুমিও কি আলো দেখেছো? তিনি নিবেদন করেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমিও দেখেছি। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, প্রথম বার যখন স্ফুলিঙ্গ বের হয় তখন আমাকে হীরা এবং কিসরা অর্থাৎ পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে আর জিবরাঈল আমাকে বলেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। দ্বিতীয়বারের স্ফুলিঙ্গের সাথে আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল রঙের প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে এবং জিবরাঈল আমাকে অবহিত করেছেন যে, আপনার উম্মত এগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করবে। আর তৃতীয়বার যখন আলোর ঝলকানি বের হয় তখন আমাকে সানা-র প্রাসাদসমূহ দেখানো হয়েছে আর জিবরাঈল আমাকে বলেছেন, আপনার উম্মত এগুলোর ওপরও কর্তৃত্ব লাভ করবে। সুতরাং তোমাদের জন্য সুসংবাদ। একথা শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠল, আলহামদুলিল্লাহ্‌! এটি একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্‌ তা'লা কষ্টের পর আমাদের সাথে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন আর মহানবী (সা.) পারস্যের প্রাসাদসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি সালমান ফার্সীকে বলতে থাকেন, তখন সালমান ফার্সী (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি সত্য বলেছেন, এগুলো সেসবেরই বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন। অর্থাৎ তিনি (সা.) যেভাবে সেই প্রাসাদসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন হযরত সালমান ফার্সী তার সত্যায়ন করেছেন। তিনি অর্থাৎ হযরত সালমান ফার্সী বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌ তা'লার রসূল। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে সালমান! এ বিজয়সমূহ আল্লাহ্‌ তা'লা আমার (মৃত্যুর) পর প্রদান করবেন। সিরিয়া বিজিত হবে এবং হিরাকেল তার রাজত্বের শেষ সীমান্তে পলায়ন করবে আর তোমরা সিরিয়ার ওপর বিজয় লাভ করবে। তোমাদের সাথে কেউ বিবাদ-বিতণ্ডা করবে না। আর এই প্রাচ্যও বিজিত হবে এবং কিসরা নিহত হবে; এরপর আর কোনো কিসরা হবে না। এ কথায় মুনাফিকরা এই বলে অনেক ঠাট্টাবিদ্রুপ করতে থাকে; এই বিপদ, অসহায়ত্ব এবং ভয় ও আতঙ্কের পরিস্থিতিতে এরূপ মহান কিন্তু বাহ্যত অসম্ভব সুসংবাদে মুমিনদের ঈমান যদিও আরও বৃদ্ধি পায় এবং এটি তাদের আত্মতৃপ্তি বৃদ্ধির কারণ হয়, কিন্তু মুনাফিকরা এতে ঠাট্টাবিদ্রুপ আরম্ভ করে দেয়। মুনাফিকরা বলে, মুহাম্মদ (সা.) তোমাদেরকে এই সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি ইয়াসরেব (বা মদীনা) থেকে **হীরা**র প্রাসাদসমূহ ও রোমান সাম্রাজ্যের শহরসমূহ দেখছেন আর তোমরা তা বিজয় করবে। অথচ তোমরা এখানে নিজেদের নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন করছো আর তোমাদের মধ্যে এই শক্তিটুকুও নেই যে, তোমরা

এখান থেকে বের হয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য কিছুটা দূরে যেতে পারো! এ প্রসঙ্গে মুনাফিকদের এই অবস্থার বহিঃপ্রকাশ আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে করেছেন যেখানে তিনি বলেন,

وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ إِلَّا غُرُورًا (সূরা আহযাব: ১৩)

অর্থাৎ, আর যখন মুনাফিকরা এবং সেসব লোকেরা যাদের হৃদয়ে ব্যাধি রয়েছে তারা বলেছিল যে, আমাদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ধোঁকা ছাড়া আর কোনো অঙ্গীকার করেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে দৃষ্টিবানরা এটি অবলোকন করেছে যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.)-র খিলাফতকালে এই সমস্ত শহর ও রাজকীয় প্রাসাদসমূহ বিজিত হয় আর এই নিঃস্ব, অসহায় ও ক্ষুধার জ্বালায় কাতর মুমিনরাই এসকল প্রাসাদের উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। হযরত সালমান ফার্সী (রা.) বর্ণনা করেন, এই সমস্ত বিজয় আমি দেখেছি।

এসব ঘটনাবলি, অর্থাৎ পাথর ভাঙা ও মুজিযা প্রদর্শিত হবার যেসব ঘটনা রয়েছে সেগুলো হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব তার নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেন,

নিদারুণ কষ্ট ও চরম পরিস্থিতিতে পরিখা খনন করার সময় এক স্থানে একটি পাথর বেরিয়ে আসে যেটিকে কোনোভাবেই ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না। আর সাহাবীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা লাগাতার তিন দিন ক্ষুধার্ত থাকার কারণে একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তারা নবী করীম (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, একটি পাথর আছে যা কোনোভাবেই ভাঙা যাচ্ছে না। সে সময় তাঁরও (সা.) এই অবস্থা ছিল যে, ক্ষুধার তাড়নায় তিনি (সা.) পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন, এতদসত্ত্বেও তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন আর একটি কোদাল নিয়ে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে সেই পাথরের ওপর আঘাত করেন। লোহা পাথরে আঘাত করতেই পাথরের মধ্য হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এর ফলে তিনি (সা.) উচ্চৈঃস্বরে **আল্লাহু আকবার** ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং বলেন, আমাকে সিরিয়া সাম্রাজ্যের চাবিসমূহ প্রদান করা হয়েছে আর খোদার কসম! এখনই সিরিয়ার লাল দুর্গগুলো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এভাবে আঘাতের ফলে সেই পাথরটি অনেকটা আলগা হয়ে যায়। এরপর তিনি পুনরায় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন। এবারও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। ফলে তিনি (সা.) পুনরায় **আল্লাহু আকবার** ধ্বনি উচ্চকিত করেন এবং বলেন, এবার আমাকে পারস্যের রাজত্ব প্রদান করা হয়েছে আর মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদসমূহ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। এই আঘাতের পর পাথরটি আরও কিছুটা দুর্বল হয়ে যায়। এরপর তিনি (সা.) তৃতীয়বার পাথরের ওপর কোদাল দ্বারা আঘাত করেন। পুনরায় এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। এবারও তিনি (সা.) **আল্লাহু আকবার** ধ্বনি উচ্চকিত করেন। তিনি (সা.) বলেন, এবার আমাকে ইয়েমেনের রাজত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্‌র কসম! সানার দরজাগুলো আমাকে এই মুহূর্তে দেখানো হচ্ছে। এবার সেই পাথরটি পুরোপুরি ভেঙে গিয়ে স্বস্থান থেকে খসে পড়ে। অপর এক বর্ণনায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) প্রত্যেকবার উচ্চস্বরে তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করেন আর পরবর্তীতে সাহাবীদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি (সা.) উক্ত কাশফ বর্ণনা করেন। আর মুসলমানগণ এই সাময়িক বাধা অতিক্রম করে পুনরায় নিজেদের কাজে মনোনিবেশ করে। মহানবী (সা.)-এর এসব দৃশ্য দিব্যদর্শনের জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

অর্থাৎ যেন সেই অভাবের যুগে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বিজয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের দৃশ্যাবলি প্রদর্শন করে সাহাবীদের মাঝে আশা ও আনন্দের স্পৃহা সঞ্চার করেন। কিন্তু বাহ্যত এ সময়টি এত কঠিন ও কষ্টকর ছিল যে, মদীনার মুনাফিকরা এসব প্রতিশ্রুতির কথা শুনে মুসলমানদের নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকে যে, ঘরের বাইরে পা রাখার যোগ্যতা নেই, অথচ সিরিয়া ও পারস্য বিজয়ের স্বপ্ন দেখা হচ্ছে! কিন্তু খোদার দরবারে এসব পুরস্কার মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং, এই অঙ্গীকারসমূহ যথাসময়ে, অর্থাৎ কিছু মহানবী (সা.)-এর জীবনের শেষ দিকে আর অধিকাংশ তাঁর (সা.) খলীফাদের যুগে পূর্ণতা লাভ করে মুসলমানদের ঈমান বৃদ্ধির ও পূর্ণতার কারণ হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ বিষয়ে লিখেছেন। তিনি বলেন, যখন পরিখা খনন করা হচ্ছিল, তখন মাটির ভেতর থেকে এমন একটি পাথর বের হয়, যেটি কারো পক্ষে ভাঙা সম্ভব হচ্ছিল না। সাহাবীরা মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়টি অবগত করেন। তিনি (সা.) স্বয়ং সেখানে গমন করেন। তিনি (সা.) কোদাল নিজের হাতে তুলে নেন এবং সজোরে সেই পাথরে আঘাত করেন। কোদালের আঘাতে সেই পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় এবং তিনি (সা.) বলে ওঠেন, **আল্লাহু আকবার**। পুনরায় তিনি (সা.) কোদাল দিয়ে আঘাত করেন এবং পুনরায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। এবারও তিনি **আল্লাহু আকবার** ধ্বনি উচ্চকিত করেন। অতঃপর তৃতীয়বার তিনি কোদাল দিয়ে পাথরে আঘাত করেন। আবারও পাথর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় এবং সাথে সাথেই পাথরটি ভেঙে যায়। এ সময় তিনি পুনরায় **আল্লাহু আকবার** ধ্বনি উচ্চকিত করেন। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তিনবার **আল্লাহু আকবার** ধ্বনি কেন উচ্চকিত করলেন? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, পাথরের ওপর কোদাল দিয়ে আঘাত করার ফলে তিনবার যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় সেই তিনবারই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলামের ভবিষ্যৎ উন্নতির চিত্র দেখিয়েছেন। প্রথমবারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাথে সিজারের শাসনাধীন সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আমাকে দেখানো হয়েছে এবং এর চাবিগুলো আমাকে প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়বারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাথে মিদিয়ানের শুভ্র প্রাসাদসমূহ আমাকে দেখানো হয়েছে এবং পারস্যের চাবিসমূহ আমাকে প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয়বারের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সাথে সানা-র দ্বারসমূহ আমাকে দেখানো হয়েছে এবং ইয়েমেনের সাম্রাজ্যের চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতির ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখো। শত্রু তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

সেই দিনগুলোতে যেসব অলৌকিক নিদর্শন ঘটে তার মাঝে খাবার সংক্রান্ত একটি নিদর্শনও রয়েছে। খাবারের আরও নিদর্শন থেকে থাকবে; কিন্তু একটি ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) খাবারের আয়োজন করেন এবং তা বরকতমণ্ডিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, হযরত জাবের (রা.) সেই দিনগুলোতেই একদিন লক্ষ্য করেন, মহানবী (সা.) তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন এবং সাহাবীরা তিন দিন ধরে সেখানে আছেন কিন্তু কোনো খাবার চেখে দেখারও সুযোগ পান নি। অর্থাৎ তিনদিন কেটে গেলেও কোনো খাবার জোটে নি। জাবের (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে বাড়ি যাবার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাকে অনুমতি দেন। আমি বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলি, আমি মহানবী (সা.)-এর চেহারায় তীব্র ক্ষুধার প্রভাব লক্ষ্য করেছি, যা দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারি নি। ঘরে কিছু আছে কি? সে বলে, ঘরে কেবল এক সা' পরিমাণ যব অর্থাৎ আড়াই সেরের সামান্য কম পরিমাণ যব আর একটি

ছাগল ছানা আছে। তখন তার স্ত্রী সেই পাত্রটি বের করেন যাতে যব ছিল আর তিনি (অর্থাৎ জাবের) বলেন যে, আমি ছাগলের বাচ্চাটি জবাই করি আর আমার স্ত্রী যব পিষে। অতঃপর আমি হাঁড়িতে মাংস ঢেলে দিই। আমার স্ত্রী বলে, খাবার যেহেতু পরিমাণে অল্প তাই চুপিসারে মহানবী (সা.)-কে বলবে। এমন যেন না হয় যে, আমাকে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের (রা.) সামনে লজ্জিত হতে হয়; অর্থাৎ মানুষ বেশি হবে আর খাবার কম পড়বে। তিনি বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হই এবং চুপিসারে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের কাছে সামান্য পরিমাণ খাবার রয়েছে। তাই আপনি আর আপনার সাথে একজন বা দুইজন চলুন। তখন মহানবী (সা.) তাঁর আঙ্গুলগুলো আমার আঙ্গুলে রাখেন এবং জিজ্ঞেস করেন, কতটুকু আছে? আমি বলি, এতটুকু। মহানবী (সা.) বলেন, এটিই যথেষ্ট এবং উত্তম। তুমি বাড়ি যাও আর নিজ স্ত্রীকে বলবে, আমি আসার পূর্বে হাঁড়ি যেন চুলা থেকে না নামায় আর রুটি বানানো আরম্ভ না করে। অতঃপর মহানবী (সা.) আহ্বান করেন, হে পরিখা খননকারীরা! জাবের তোমাদের জন্য খাবারের আয়োজন করেছে। সবাই চলে আসো। মহানবী (সা.) সবার সম্মুখে হাঁটা আরম্ভ করেন। আর আমি এত লজ্জা পাচ্ছিলাম যা কেবল আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। আমি মনে মনে বলি, এখানে তো অনেক লোক চলে এসেছে। মাত্র এক সা' যব আর একটি ছাগলের বাচ্চার মাংস দিয়ে এত বেশি লোককে খাবার খাওয়ানো! খোদার কসম, খুবই লজ্জিত হতে হবে! আমি ঘরে ফিরে স্ত্রীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাই যে, মহানবী (সা.) তাঁর সাথে আনসার ও মুহাজিরদের নিয়ে আসছেন। স্ত্রী বলে, তোমার মঙ্গল হোক, আমি তোমাকে চুপিসারে নিবেদন করতে বলেছিলাম। স্বামী স্ত্রীকে জবাবে বলেন, তুমি আমাকে যেভাবে বলেছিলে আমি ঠিক সেভাবেই বলেছি। স্ত্রী বলে, তাহলে বাকি লোকদের তুমি দাওয়াত দিয়েছো নাকি মুহাম্মদ (সা.)? উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) দাওয়াত দিয়েছেন। একথা শুনে ঈমান ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ তার (রা.) স্ত্রী বলেন, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। এখন আর চিন্তার কিছু নেই। এটি হলো সেই নারীর ঈমান যিনি তখন ঈমান ও নিষ্ঠায় তার স্বামীর চেয়েও অগ্রগামী হয়ে গিয়েছিলেন। জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, অতঃপর মহানবী (সা.) আমাদের ঘরে প্রবেশ করেন এবং বলেন, তোমরা দশজন করে ঘরে প্রবেশ করো; [অর্থাৎ যারা এসেছিলেন তাদেরকে দশজনের এক একটি দলে ভাগ করে দেন।] আর জাবের (রা.)-র স্ত্রী যখন আটা বের করেন তখন তিনি (সা.) তাতে লালা মিশ্রিত করেন এবং বরকতের জন্য দোয়া করেন। এরপর আমাদের হাঁড়িতে লালা মিশিয়ে বরকত সৃষ্টির জন্য দোয়া করেন। অতঃপর তিনি (সা.) আমাদের বলেন, রুটি বানাও আর তরকারি ঢালো এবং হাঁড়ি ঢেকে দাও। আবার চুলা (তন্দুর) থেকে রুটি বের করো আর রুটিগুলোও ঢেকে দাও। তখন আমরা তা-ই করি। আমরা তরকারি বের করতাম আর মহানবী (সা.) হাঁড়ি ঢেকে দিতেন। এরপর পুনরায় তা খুলে দিলে আমরা দেখি যে, তা থেকে কিছুই কমে নি। একইভাবে চুলা থেকে রুটি নামিয়ে তা ঢেকে রাখতেন। তা থেকেও কিছুই কমতো না। তিনি (সা.) রুটি টুকরো করতেন এবং এতে মাংস রাখতেন এবং নিজের সাহাবীদের নিকটে দিয়ে বলতেন, খাও। যখন এক দল তৃপ্তি সহকারে আহার করে চলে যেত তখন অপর দলকে ডাকতেন। এমনকি এক হাজার লোক সেই খাবার গ্রহণ করে এবং সবাই চলে যায়। আর আমাদের হাঁড়ি পূর্বের ন্যায় ফুটছিল এবং আমাদের আটা পূর্বের ন্যায়ই পড়ে ছিল। তিনি (সা.) বলেন, এটা তোমরা খাও এবং অন্যদেরও পাঠাও, কেননা লোকেরা অনেক ক্ষুধার্ত।

এই ঘটনাটিকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও লিখেছেন। তিনি এভাবে বর্ণনা করেন,

একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাঁর (সা.) চেহারায় ক্ষুধার কারণে দুর্বলতা ও ক্লান্তির লক্ষণ দেখে তাঁর (সা.) কাছে নিজ ঘরে যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ করেন। ঘরে এসে তিনি নিজের স্ত্রীকে বলেন, মহানবী (সা.) ক্ষুধার তীব্রতার কারণে ভীষণ কষ্টে আছেন বলে মনে হচ্ছে। তোমার কাছে কি খাবার কিছু আছে? তিনি বলেন, কিছুটা যবের আটা এবং একটি ছাগল আছে। জাবের (রা.) বলেন, তখন আমি ছাগলটি জবাই করি এবং আটা প্রস্তুত করি। এরপর তিনি নিজের স্ত্রীকে বলেন, তুমি খাবার প্রস্তুত করো। আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করছি যেন তিনি আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। আমার স্ত্রী বললো, আমাকে আবার অপমানিত কোরো না। খাবার অল্প, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বেশি লোক যেন না আসে। জাবের বলেন, আমি গিয়ে একান্তে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার কাছে কিছু মাংস এবং যবের আটা আছে, যেগুলো রান্না করার জন্য আমি নিজের স্ত্রীকে বলে এসেছি। আপনি আপনার কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসুন এবং খাবার গ্রহণ করুন। তিনি (সা.) বলেন, কতটুকু খাবার আছে? আমি নিবেদন করলাম, এই এই পরিমাণ আছে। তিনি (সা.) বলেন, যথেষ্ট আছে। এরপর তিনি (সা.) নিজের আশেপাশে দৃষ্টি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, হে আনসার ও মুহাজিরদের দল! জাবের আমাদের দাওয়াত করেছে, চলো গিয়ে খেয়ে আসি। এই ডাকে প্রায় এক হাজার ক্ষুধার্ত সাহাবী তাঁর সাথে রওয়ানা হন। তিনি (সা.) জাবের (রা.)-কে বলেন, তুমি দ্রুত যাও এবং নিজের স্ত্রীকে বলো, আমার না আসা পর্যন্ত হাঁড়ি যেন চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি বানানো আরম্ভ না করে। জাবের দ্রুত গিয়ে নিজের স্ত্রীকে সংবাদ দেন আর সেই বেচারী ভীষণ ঘাবড়ে যায় যে, খাবার তো শুধু কয়েকজনের অনুমান করে রান্না করা হয়েছে, অথচ আসছে এত লোক! এখন কী হবে? কিন্তু মহানবী (সা.) সেখানে পৌঁছতেই প্রশান্তচিত্তে হাঁড়ি এবং আটার পাত্রে দোয়া করেন আর এরপর বলেন, এখন রুটি বানানো আরম্ভ করো। এরপর তিনি ধীরে ধীরে খাবার বিতরণ করার কথা বলেন। জাবের বর্ণনা করেন যে, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই পরিমাণ খাবারেই সবাই তৃপ্তি সহকারে আহার করে স্থান ত্যাগ করে, অথচ তখনও আমাদের হাঁড়ি একইভাবে টগবগিয়ে ফুটছিল এবং আটা একইভাবে রান্না হচ্ছিল। আহযাবের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাকি কথা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

দোয়ার দিকে আমি মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকি, এদিকে অনেক মনোযোগ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের ঈমানকে দৃঢ়তা দান করুন আর প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক দেশে বসবাসকারী আহমদীদের– বাংলাদেশে, পাকিস্তানে এবং অন্যান্য স্থানেও সকল অনিষ্ট থেকে সকল আহমদীকে তিনি রক্ষা করুন। আর পৃথিবীকেও– যে আগুনে তারা পড়তে যাচ্ছে এবং যেদিকে যাওয়ার দ্রুত চেষ্টা করে যাচ্ছে– তা থেকে আল্লাহ্ তা'লা জগদ্‌বাসীকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল শক্তির অধিকারী। যদি এই লোকেরা এখনও সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এসব বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, তাদের যেন বিবেকবুদ্ধির উদয় হয়।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)